The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXII, pp 143-157, ISSN 2306-3920

বাংলাদেশে নব্বই দশকের চলচ্চিত্রে নারী

রুবাইয়াৎ আহমেদ*

[**সার-সংক্ষেপ:** বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে নব্বইয়ের দশক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। তবে তা মোটেও ইতিবাচক অর্থে নয়। এই দশকে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলো বাণিজ্যিকীকরণের চূড়ান্ত প্রচেষ্টার উদাহরণ যেন। সেই প্রচেষ্টার জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে নারীদের। অর্থাৎ নারীকে ভোগসর্বস্ব উপাদানরূপে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে লগ্নিকৃত অর্থ উসুল করাই ছিল এর মূল লক্ষ্য। চলচ্চিত্রগুলো পুরুষ দর্শকের তথাকথিত বিনোদন জোগানের মাধ্যম হিসেবে আবির্ভূত হয় যেন। ফলে সেগুলো নির্মাণে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির জোরালো উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এই দশকে অর্থাৎ ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত কালপর্বে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলো থেকে দৈবচয়ন পন্থায় নির্বাচিত পাঁচটি চলচ্চিত্র বিশ্লেষণের আওতায় আনা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে এই দশকের মূলধারার চলচ্চিত্রের প্রভাবশালী প্রবণতাসহ অন্যবিধ প্রবণতারও রূপ নির্ণয়ের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। যে চলচ্চিত্রগুলোকে আধেয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে : *দাঙ্গা*, *কেয়ামত থেকে কেয়ামত*, *আগুনের পরশমণি*, *রাঙা বউ* ও *আম্মাজান*। উল্লেখ্য পাঁচটি চলচ্চিত্রের মধ্যে তিনটি চলচ্চিত্র (*দাঙ্গা*, *রাঙা বউ*, *আম্মাজান*) সহিংসতা, অশ্লীলতাসহ নারীদের ওপর নিপীড়নের নানামাত্রিক উপস্থাপনার দোষে সমালোচিত ও আলোচিত হয়েছে। একটি চলচ্চিত্র ভারতীয় চলচ্চিত্রের সরাসরি অনুকরণে নির্মিত (*কেয়ামত থেকে কেয়ামত*)। অপর একটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র (*আগুনের পরশমণি*) এ অধ্যায়ে দশকের সুস্থধারার প্রতিনিধিত্বকারী ও শিল্পমানবিচারে অগ্রসর বিবেচনায় আলোচনা করা হয়েছে। সবগুলো চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেই অন্যবিধ বিষয়ের চেয়ে নারীচরিত্রকে কীভাবে নির্মাণ কিংবা উপস্থাপন করা হয়েছে তা বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে বক্ষ্যমান প্রবন্ধে।]

ভূমিকা

পৃথিবীর কোনো শিল্পের জন্ম ও বিকাশে একক কোনো ব্যক্তি অথবা একই ধারার মানুষ কৃতিত্ব দাবি করতে পারে না, অর্থাৎ তাতে থাকে অগণিত মানুষের শ্রম-ঘাম-মেধা ও মনন। চলচ্চিত্রও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ করি, অন্য অনেককিছুর মতো চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও উদ্ভব-বিকাশের একক কৃতিত্ব পুরুষের ভাণ্ডে জমা করা হয়েছে। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ ও নন্দনতাত্ত্বিক বিকাশের মধ্যদিয়ে আজ চলচ্চিত্র এক শক্তিশালী শিল্পমাধ্যম। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও চলচ্চিত্র ধারাবাহিক বিবর্তনের পথ বেয়ে বর্তমান অবস্থানে পৌঁছেছে। আর সেই পথপরিক্রমায় অংশ নিয়েছে অগণিত নারী-পুরুষ। কিন্তু আর সব ক্ষেত্রের মতো চলচ্চিত্রেও নারীর যথাযথ অবস্থান স্বীকৃত

---

* **ড. চৌধুরী রুবাইয়াৎ আহমেদ:** সহকারী অধ্যাপক, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

নয়। বরং পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীকে পণ্যরূপে ব্যবহারের প্রচেষ্টাই অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে। পিতৃতন্ত্র কী?

> সাধারণভাবে পুরুষের আধিপত্য ও নারীর ওপর পুরুষের কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ন রাখার সম্পর্ক বোঝাতেই এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়। পিতৃতন্ত্র একটি বিশেষ ব্যবস্থা যা মেয়েদের নানান প্রক্রিয়ায় অধীন করে রাখে। (কমলা ভাসীন, ১৯৯৫ : ০১)।

এই ব্যবস্থার অধীনে সবকিছুর মতো সৃষ্টিশীল বিষয়গুলোতেও তার প্রভাব থাকবে নিশ্চিতভাবেই। আমাদের চলচ্চিত্রেও তার ছাপ পড়েছে উল্লেখযোগ্য মাত্রায়। তার রূপ কেমন? সমালোচকের মতে–

> চলচ্চিত্র, দূরদর্শন থেকে শুরু করে সংবাদপত্র, পত্রপত্রিকা, বেতার ইত্যাদি সর্বত্রই মেয়েদের একটা নির্দিষ্ট ধাঁচে ফেলে দেখানো হয়; প্রচারমাধ্যমগুলো মেয়েদের বিকৃতভাবে উপস্থাপিত করে। পুরুষের উৎকর্ষ এবং নারীর হীনতার ছবি বার বার ফুটে ওঠে, বিশেষ করে চলচ্চিত্রে নারীর ওপর নির্যাতন ও অত্যাচারের ঘটনা খুবই প্রাধান্য পায়। (কমলা ভাসীন, ১৯৯৫ : ১০)।

দশক বিভাজনের সূত্রে আমরা লক্ষ করি, গেল শতকের নব্বইয়ের দশকের চলচ্চিত্রেই নারীকে অধিকমাত্রায় অধীনস্ত, নিষ্ক্রিয় ও পণ্যরূপে ব্যবহার করার প্রচেষ্টা ছিলো। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে এই বিষয়েই আলোকপাত করার চেষ্টা নেয়া হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

শিল্পমাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের যে সম্ভাবনা ছিল তা সময় পরিক্রমায় পুঁজির বিকাশ ও দাপটে মার খেতে থাকে। পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থায় চলচ্চিত্র ক্রমে ব্যবসায়ী মুনাফার অন্যতম একটি অবলম্বন হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে থাকেন নারীরা। চলচ্চিত্রবিশ্বের এই অন্যতম প্রবণতা থেকে বলাইবাহুল্য বাংলাদেশের চলচ্চিত্রও মুক্ত নয়। আমরা দেখতে পাই মূলত মুনাফাকেন্দ্রিক মনোবৃত্তি থেকে এদেশীয় চলচ্চিত্রেও বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়েছেন নারীরা। তাতে সমর্থন যুগিয়েছে আধিপত্যবাদী পিতৃতন্ত্র। এই প্রবণতা মহামারী আকার ধারণ করে বিগত শতকের নব্বইয়ের দশকে নির্মিত চলচ্চিত্রসমূহে। ওই কালপর্বে চলচ্চিত্রে নারীকে অধঃস্তন হিসেবে উপস্থাপনের যে সংস্কৃতি এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক ব্যবস্থার প্রভাবসম্পর্কিত রূপ অন্বেষণই এই গবেষণার উদ্দেশ্য।

গবেষণা পদ্ধতি

প্রকৃতি বিচারে এই রচনা 'কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ' বা 'গুণাত্মক গবেষণা'র অন্তর্গত। এতে 'কনটেন্ট' বা 'আধেয়' ও 'টেক্সুয়্যাল অ্যানালাইসিস' বা 'মুদ্রিত পাঠ্যবস্তু বিশ্লেষণ'-এর ব্যবহার হবে। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে নারীর অবস্থানজনিত রূপনির্মাণের ক্ষেত্রে আলোচনা-সমালোচনার দৃষ্টান্ত সীমিত। এ সংক্রান্ত গ্রন্থও অপ্রতুল। পত্রপত্রিকাতেও চলচ্চিত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট নারীদের নিয়ে একধরনের ছকেবাঁধা কথাসমাহার লভ্য। ফলে গবেষণাকালে চলচ্চিত্রের সিডি কিংবা ডিভিডি ছাড়া আর কোনোকিছুর সমর্থন পাওয়া সম্ভব হয়নি। আধেয়রূপে গৃহীত চলচ্চিত্রটি দর্শন ও তৎপরবর্তী স্বাধীন সমালোচনার ধারায় গবেষককে অগ্রসর হতে হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সম্পর্কের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় রাখতে হয়েছে।

দাঙ্গা

কাহিনি, সংলাপ, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা: কাজী হায়াৎ, চিত্রগ্রহণ: আজমল হক, সম্পাদনা: সাইফুল ইসলাম, প্রযোজক: মিসেস হেলেন মুস্তাফিজ, সংগীত: আহমেদ

ইমতিয়াজ বুলবুল, অভিনয়ঃ মান্না, আনোয়ারা, মিজু আহমেদ, রাজীব, সুচরিতা, কাজী হায়াৎ, দিলদার, দুলারী প্রমুখ। মুক্তিকাল: ১৯৯২ (দাঙ্গা, ১৯৯২)।

দাঙ্গা/কাজী হায়াৎ/১৯৯২

ছোটো মফস্বল শহর বেগুনবাড়ি। সেখানকার সংসদ সদস্য আবুল হোসেন অনেকদিন ধরে মন্ত্রী হওয়ার চেষ্টা করছেন। বেগুনবাড়ির চেয়ারম্যান লিটন আখতার আবুল হোসেনের কাছের লোক। সে আবুল হোসেনের সাহায্যে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে এলাকায় অপকর্ম করে থাকে। সরকার থেকে প্রাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী জনগণের মধ্যে অল্প পরিমাণ বিলিয়ে বাকিটুকু গুদামজাত করে। নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়ে ছবি অভাবের তাড়নায় ত্রাণসামগ্রী নিতে গেলে চেয়ারম্যানের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে তার দিকে। স্থানীয় কলেজের ভিপি ছাত্রনেতা হাবিব ছবিকে লিটনের হাত থেকে উদ্ধার করে এবং গুদামজাত ত্রাণসামগ্রী এলাকার গরিব জনগণকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সুযোগ করে দেয়। এতে সংসদ সদস্য আবুল হোসেন হাবিবের উপর ক্ষিপ্ত হন। পূর্বেও হাবিব নির্বাচনের সময় তার বিরোধিতার করেছিল বলে আবুল হোসেন আগে থেকেই তার উপর ক্ষিপ্ত ছিলেন। ফলে সে চেয়ারম্যানকে নির্দেশ দেয় হাবিবকে খুন করার জন্য। চেয়ারম্যান সন্ত্রাসী, ভাড়াটে খুনি কালুকে দিয়ে হাবিবকে খুন করায়। হত্যা করার সময় বৃদ্ধ নাপিত অমূল্য প্রামাণিক তাকে দেখে ফেলে। কালু তার দুই চোখ ও জিহ্বা কেটে ফেলে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে ছেড়ে দেয়।

হাবিব হত্যার তদন্তের জন্য বেগুনবাড়ি এলাকায় ওসি হিসেবে বদলি হয়ে আসে রাজু। হাবিব হত্যার তদন্ত করতে গিয়ে অসহায় যুবতী ছবির পরিবারের পাশে দাঁড়ায় রাজু। এতে সংসদ সদস্য আবুল হোসেন, চেয়ারম্যান ও খুনি কালুর সাথে তার বিরোধ লেগে যায়। রাজুর সহযোগিতায় হাবিব হত্যার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী অমূল্য প্রামাণিক সাক্ষ্য দিয়ে দেয়। সাক্ষ্য দেওয়ার কারণে কালু অমূল্যের দুটি চোখ তুলে নেয় ও জিহ্বা কেটে দেয়। অন্ধ ও বোবা অমূল্য প্রামাণিককে রাজু তার বাড়িতে আশ্রয়

দেয়। কালু অমূল্য ও রাজুর গর্ভবতী স্ত্রী ছবিকে খুন করে পালিয়ে যাওয়ার সময় রাজুর গুলিতে মারা যায়। অন্যদিকে আবুল হোসেন মন্ত্রিত্ব লাভ করার পর এক সংবর্ধনায় আসলে রাজু তাকে গুলি করে অপরাধী চক্রের প্রধানকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় (https://bn.wikipedia.org/wiki/দাঙ্গা_(১৯৯২-এর_চলচ্চিত্র)।

চলচ্চিত্রটির আধেয় বিশ্লেষণপূর্বক দেখা যায়, পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যবাদের নগ্ন প্রকাশ ও রাজনৈতিক বক্তব্যের উচ্চকিত প্রকাশ এর সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। সহিংসতার নানামাত্রিক উপস্থাপনাও এতে লভ্য। তার সঙ্গে সুকৌশলে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ। তবে তা যৌক্তিক পরম্পর্যের চেয়ে সাধারণ মানুষের এ সম্পর্কিত অনুভূতিকে পুঁজি করাই মূল উদ্দেশ্য ছিল বলে বিবেচনা করা যায়। কেননা *দাঙ্গায়* চিত্রায়িত অসৎ রাজনৈতিক নেতার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য মুক্তিযোদ্ধা-পুলিশ কর্মকর্তাকে উপস্থাপন অনিবার্য ছিল না। ইতিবাচক মানসিকতার অধিকারী যে-কোনো সাহসী মানুষই এই লড়াইয়ে নেতৃত্বে আসতে পারতো। ফলে নন্দনতাত্ত্বিক বিচারে কাহিনির গঠনে তা বাড়তি কোনো সৌন্দর্য বর্ধন করে না কিংবা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে না। কিন্তু এরপরও চলচ্চিত্রটি বাণিজ্যিকভাবে সফল হয়। আর এরপরই এ ধারার কাহিনি নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রবণতা নব্বই দশক জুড়েই দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে সমালোচক বলেন:

> কাজী হায়াৎ 'রাজনৈতিক গডফাদার-অসৎ পুলিশ-প্রতিবাদী নায়ক' ফর্মুলায় পরপর দাঙ্গা (১৯৯২) ও ত্রাস (১৯৯২) নামক দুটি এ্যাকশন ছবি নির্মাণ করলে তা দর্শক গ্রহণ করে এবং মান্না-অভিনীত এই ধারার ছবির কদর বাড়ে (নাসরীন এবং হক, ২০০৮ : ৬৩)।

দাঙ্গায় নারীর প্রতিবাদী হয়ে ওঠার দৃশ্য রয়েছে। আমরা দেখতে পাই, জনৈক নারী রিলিফের শাড়ি না পেয়ে প্রতিবাদস্বরূপ সবার সামনে নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এ ধরনের দৃশ্যকল্পনা বিবেকবোধ সম্পন্ন যে-কারো মনে করুণার বিকাশ ঘটাবে সত্য। কিন্তু তা নারীর বলিষ্ঠ চরিত্রের দিক উন্মোচন করে না, কেননা পরক্ষণেই আমরা দেখি কলেজের ভিপি জাতীয় পতাকা দিয়ে ওই নগ্ন নারীর নগ্নতাকে ঢেকে দিচ্ছেন আর এর মধ্য দিয়ে পুরুষের ওপর মহত্ব আরোপিত হয়ে যায়। রাজনীতি যদি অপবৃত্তে আটকে গিয়ে থাকে তবে তা রাজনীতিকেন্দ্রিক ক্ষমতার যে-কোনো প্রান্তকে ছুঁয়ে যাবে নিশ্চিত। ওই অঞ্চলের 'দণ্ডমুণ্ডের কর্তা' অর্থাৎ রাজনৈতিক নেতা যদি সৎ হয়ে না থাকেন তবে তারই ক্ষমতার বলয়ে থাকা আর একটি কেন্দ্রের নেতৃত্বে দেওয়া মানুষটি সৎ এই বিবেচনা ঠিক স্বাভাবিক বলে বোধ হয় না। অর্থাৎ যিনি ভিপি তিনি তো রাজনৈতিক গডফাদারের ক্ষমতা বলয়ের বাইরে থাকা কেউ নন। এ ধরনের পরস্পর বিপরীতমুখী অবস্থা পুরুষতন্ত্র সুচতুরভাবে পরিচর্যা করে থাকে। তাতে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে অন্য কারো ওপর ভর দিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে, তার হাতেই অর্পিত হয় পরবর্তী আশা বাস্তবায়নের ভার। কিন্তু মূল নেতৃত্বে থাকা ব্যক্তিটির তাতে তেমন কোনো সমস্যা হয় না এ কারণেই, যে নতুন, যাকে কেন্দ্র করে এই স্বপ্ন বা আশা নির্মাণের প্রক্রিয়া তারও একপ্রান্তের সূতা থাকে সেই গডফাদারের কাছেই।

দাঙ্গায় আমরা দেখতে পাই, নগ্ন হয়ে প্রতিবাদ জানানো নারীকেই বিয়ে করছেন জনৈক আদর্শবান মুক্তিযোদ্ধা-পুলিশ কর্মকর্তা। কিন্তু তার আগে জানানো হয়, এই নারী বর্তমানে বহন করে চলা পরিচয় প্রকৃত পরিচয় নয়। সে ভদ্রঘরের মেয়ে এবং তার ভাই যুদ্ধে শহিদ হয়েছে। অর্থাৎ এই পরিচয়টুকু উপস্থাপন করা না হলে পুলিশ কর্মকর্তার সাথে নারীটির বিয়ে ঠিক মানানসই নয় পিতৃতন্ত্রের কাছে। কেননা পিতৃতন্ত্র শ্রেণিগত ব্যবধান জিইয়ে রাখে, উঁচু-নীচু জাতিগত ভেদ রেখা ওই তন্ত্রে প্রবল। তাই কাজের মহিলার মেয়ের সাথে পুলিশ কর্মকর্তার বিয়ে হয়ে যাওয়ার ঠিক আগে একটি সংক্ষিপ্ত গল্প বলার মাধ্যমে বিষয়টিকে পিতৃতন্ত্রের আদর্শ অনুসারে সাম্য রক্ষা করা হয়।

চলচ্চিত্রটিতে আমরা নারীকে সবসময় অসহায় আর নিপীড়নের শিকার হিসেবে দেখতে পাই। ঘটনার গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে তার উপস্থিতি রয়েছে মাত্র কিন্তু নারীর উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ করার মাধ্যমে তা পালটে দেওয়ার কোনো সম্ভাবনা চলচ্চিত্রটির কোনো পর্যায়েই লক্ষ করা যায় না।

কেয়ামত থেকে কেয়ামত

কাহিনিঃ নাসির হোসেন খান (ভারত), চিত্রনাট্য ও পরিচালনাঃ সোহানুর রহমান সোহান, চিত্রগ্রহণঃ জাহাঙ্গীর এন্ড জাহাঙ্গীর, প্রযোজকঃ আনন্দমেলা সিনেমা লিমিটেড, মনোয়ার হোসেন ডিপজল, সংগীতঃ আনন্দ মিলিন্দ (ভারত), আলম খান (বাংলাদেশ), অভিনয়ঃ মৌসুমী, সালমান শাহ, রাজীব, আহমেদ শরীফ, দিলারা জামান, আবুল হায়াত, টেলি সামাদ, খালেদা আক্তার কল্পনা, ডন, সিরাজুল ইসলাম সিরাজ, জাহানারা আহমেদ, ব্ল্যাক আনোয়ার, রাবিন, অমল বোস, সাইফুদ্দিন প্রমুখ। মুক্তিকাল : ১৯৯৩ (কেয়ামত থেকে কেয়ামত, ১৯৯৩)।

কেয়ামত থেকে কেয়ামত/সোহানুর রহমান সোহান/১৯৯৩

গ্রামের প্রভাবশালী দুই পরিবারের আভিজাত্য ও ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের জেরে তরুণ দুটি প্রাণের করুণ পরিণতি *কেয়ামত থেকে কেয়ামত* চলচ্চিত্রের মূল কাহিনি। উইলিয়াম শেক্সপিয়রের 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট' নাটকের প্রবল প্রভাবজাত এই চলচ্চিত্রের কাহিনি পরম্পরায় দেখা যায়, গ্রামের চৌধুরি ও মির্জা পরিবারের ছেলে-মেয়ের মাঝে প্রণয়ঘটিত সম্পর্কে মির্জা পরিবারের এক নারী গর্ভবতী হয়ে পড়ে। কিন্তু চৌধুরি পরিবারের ছেলে সেই সন্তানের দায়িত্ব গ্রহণে অপারগতা জানিয়ে অন্যত্র বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। লোকলজ্জা ও অপমানে মির্জা পরিবারের মেয়েটি আত্মহত্যা করে। মেয়েটির ভাই ক্ষিপ্ত হয়ে চৌধুরি বাড়ির ছেলেকে গুলি চালিয়ে হত্যা করে। বিচারে মেয়েটির ভাই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। এরপর মির্জা পরিবার গ্রামের সম্পদ বিক্রি করে ঢাকায় চলে আসে। এদিকে যাবজ্জীবন দণ্ডিত মির্জা পরিবারের সেই সদস্যের ছেলে কলেজে পড়াশোনা শেষ করে। একসময় গ্রামে থাকা অবশিষ্ট জমি-জমা নিয়ে ঝামেলার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি সুরাহার উদ্দেশে সেই ছেলেকে পাঠানো হয়।

গ্রামে যাওয়ার পর চৌধুরি বাড়ির এক মেয়েকে ভালো লেগে যায় তার। সময় পরিক্রমায় সেই ভালো লাগা থেকে উভয়ের মাঝে প্রণয়ের সৃষ্টি হয়। বিষয়টি দুই পরিবারের মাঝে জানাজানি হলে কোনো পরিবারই তা মেনে নেয় না। পরিবারের বাধা উপেক্ষা করে তারা পালিয়ে যায় পাহাড়ে। কিন্তু চৌধুরি পরিবারের ভাড়া করা খুনিরা ঠিক তাদের পেয়ে যায়। এক পর্যায়ে প্রেমিককে বাঁচাতে প্রাণ দেয় প্রেমিকা। আর প্রেমিকার মৃত্যু দেখে নিজের সঙ্গে থাকা ছুরিতে আত্মাহুতি দেয় প্রেমিক নিজেও।

ভারতীয় টিন-এজ প্রেমভিত্তিক চলচ্চিত্রের সরাসরি অনুকরণে নির্মিত হয়েছে *কেয়ামত থেকে কেয়ামত* চলচ্চিত্রটি। ইতোপূর্বে বাংলাদেশে একই ধারার চলচ্চিত্র নির্মিত হলেও মূলত *কেয়ামত থেকে কেয়ামত* চলচ্চিত্রটির মধ্য দিয়ে এ ধরনের কাহিনিনির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণের সংখ্যা বেড়ে যায়। এ প্রসঙ্গে সমালোচক বলেন:

> সুপারহিট টিন-এজ প্রেমের ছবি *কেয়ামত থেকে কেয়ামত* (১৯৯৩)। পরিচালক সোহানুর রহমান সোহান মৌলিক গল্পও বাছেন নি, আবার নকল কাহিনীর দুর্নামও কুড়াতে চাননি। তিনি মুম্বাই থেকে সুপারহিট ছবি কেয়ামত সে কেয়ামত তক ছবির কপিরাইট নিয়ে শট বাই শট দৃশ্যায়ন করেন, এবং তাতেই ছবি সুপারহিট হয় (নাসরীন এবং হক, ২০০৮ : ৬২)।

অর্থাৎ চলচ্চিত্রটি ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্ধ অনুকরণ মাত্র। কিন্তু বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে নারীদের উপস্থাপনের যে ধারা ভারতীয় চলচ্চিত্রেও প্রায় একই ধারা বিরাজমান। ফলে আমরা চলচ্চিত্রটির আধেয় বিশ্লেষণ করে দেখতে পাই, তাতে পুরুষাধিপত্য প্রবলভাবে বিরাজমান। পিতৃতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় নারীর হীন অবস্থার আরও একটি নিদর্শন চলচ্চিত্রটিতে লভ্য। দুই পরিবারের ঐতিহাসিক যে দ্বন্দ্ব তা একজন নারীকে কেন্দ্র করে। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি পরিবারে নারীর মতামত গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা দেখতে পাই একই গ্রামের দুই সামন্ত পরিবারের দুই সদস্যের প্রেম একপক্ষীয় প্রতারণার কারণে কোনো পরিণতি লাভ করে না। পুরুষের ভোগলিপ্সার কারণে প্রেমের বাতাবরণে এক পরিবারের নারী সদস্য তার গর্ভে সন্তানধারণ করে। এ ঘটনার সামাজিক স্বীকৃতির বিষয়টি সামনে চলে আসায় সংশ্লিষ্ট সামন্ত পরিবারের পুরুষ সদস্যটি বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানায়। উলটো টাকার বিনিময়ে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা চালায়। তার এই অনৈতিক প্রচেষ্টার ঘটনা তার মা জানতে পেরে ওই পুরুষের পিতা ও পরিবারের প্রধান কর্তা ব্যক্তিকে বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করে নারীটিকে স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে পরিবারে গ্রহণ করার পরামর্শ দেন। কিন্তু তা মেনে নেওয়া হয় না পিতৃতান্ত্রিক অহমিকা থেকে। উলটো ওই নারীর সন্তান ধারণ করার বিষয়টি নিয়ে তার চারিত্রিক সততা নিয়ে প্রশ্ন তুললেও সহযোগী অপর ব্যক্তি সম্পর্কে নীরব থাকেন কর্তা ব্যক্তি। কারণ সহযোগী হচ্ছে প্রথমত পুরুষ, দ্বিতীয়ত তারই পুত্র। এর মধ্য দিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের সূচনা। আমরা দেখতে পাই, গর্ভধারণকারী নারীটির জন্য ওই সামন্ত পরিবার সমাজে হেয় প্রতিপন্ন হবে বলে নানা আশঙ্কা ব্যক্ত করছে। এ ঘটনার সমাধান হিসেবে নারীটি আত্মহত্যা করে। এর মধ্য দিয়ে এই বার্তাই দর্শক দেখতে পান, এ ধরনের সমাজ স্বীকৃতিহীন গর্ভধারণ একটি অমোচনীয় কলঙ্ক আর তা থেকে মুক্তির উপায় হচ্ছে সংশ্লিষ্ট নারীর আত্মহনন।

আর ওই নারী আত্মহননের পর নারীর ভাই বন্দুকের গুলিতে হত্যা করে বোনের গর্ভে সন্তান ধারনে সহযোগী পুরুষকে। এখানে লক্ষণীয় পারিবারিক সম্মান রক্ষাকল্পে নারীটি আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। এবং তার ভাই বোনের সামাজিক স্বীকৃতি অর্জিত না হওয়াজনিত কারণে হত্যাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। আমরা দেখতে পাই, পিতৃতন্ত্রের রূপ। কেননা পুরুষের লাম্পট্য অথবা প্রতারণা মানুষ হিসেবে তাকে মূল্যায়নে কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে না। যে-কোনো মূল্যে বোনকে ওই পুরুষের হাতে অর্পণ করতে পারলে বিষয়টির নিষ্পত্তি ঘটতো এই ভেবে যে, তাতে

সামাজিক স্বীকৃতিটি অর্জিত হতো। নারী ওই দুর্বল ও লোভী ব্যক্তির সাথে জীবনযাপনে স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত আনন্দময় জীবন পেতো কিনা তা কোনো বিবেচনাতেই রাখা হয়নি। কেননা পিতৃতন্ত্রে স্বাভাবিক ও আনন্দময় জীবন উপভোগের একমাত্র অধিকার পুরুষের। এবিষয়গুলোয় নারীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া স্বীকৃত নয়। এ কারণে মানুষের জীবনের চেয়ে পারিবারিক সম্মান বড়ো হয়ে দেখা দেয়।

পরবর্তী পর্যায়ে দুই সামন্ত পরিবারের মধ্যে আবারও দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। তার কারণও ওই দুই পরিবারের নারী-পুরুষের মধ্যেকার প্রেম। আমরা লক্ষ করি, পরিবারের নারী সদস্যের মতামতকে তোয়াক্কা না করেই তার পিতা তাকে পাত্রস্থ করার অর্থাৎ বিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এবং তাতে তার দাম্ভিক উচ্চারণ এ বার্তাই প্রকাশ করে, পরিবারে নারীর কোনো মতামত নেই। পুরুষের মতামতই নারীর শিরোধার্য। এমন কী পরিবারের জ্যেষ্ঠতম সদস্যের অনুরোধও ঘটনার দিক ফেরাতে পারে না, কারণ সদস্যটি নারী।

নারী-পুরুষের এমনই বৈষম্যমূলক বিভিন্ন উপাদান আমরা খুঁজে পাই *কেয়ামত থেকে কেয়ামত* চলচ্চিত্রটিতে। তাতে পরিচালক ক্যামেরার বিভিন্ন শটও গ্রহণ করেছেন পুরুষ দর্শকের কথা মাথায় রেখে। এ জন্য আমরা দেখতে পাই নারী শরীরের স্পর্শকাতর ও যৌনতার ইঙ্গিতবাহী বিভিন্ন স্থান ক্লোজ ও মিডক্লোজ শটের মাধ্যমে যৌন উপাদান করে তোলার সচেতন প্রয়াস। তাই নিজ স্বপ্ন বাস্তবায়নে পরিবারের অবাধ্য হয়ে কাঙ্ক্ষিত জনের সাথে ঘর ছাড়ার যে সাহসী যাত্রা তা আর অক্ষুণ্ন থাকে না। আমরা বিবেচনা করতে থাকি, জনমানবহীন স্থানে একটি পুরুষের সাথে একটি নারীকে পাঠানো হয়েছে নারীকে যৌন উপাদানরূপে পুরুষ দর্শকের ভোগ্য করে তোলার অভিপ্রায়ে। এ কারণে পরিবারের পিতৃতান্ত্রিক বলয়কে উপেক্ষা করে নারীর এই সাহসী পদক্ষেপটিও মহিমা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। চলচ্চিত্রটি তখন পুঁজিতান্ত্রিক মুনাফালোভী ব্যবস্থারই ধারক বলে গণ্য হয়েছে। এই ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক হচ্ছে পুরুষ তথা পুরুষতন্ত্র। ফলে স্বাভাবিকভাবেই নারীর বৈষম্যমূলক হীন ও অধঃস্তন ব্যক্তিত্বই চলচ্চিত্রটিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

আগুনের পরশমণি

কাহিনি, চিত্রনাট্য ও পরিচালনাঃ হুমায়ূন আহমেদ, চিগ্রহণঃ আখতার হোসেন, সম্পাদনাঃ আতিকুর রহমান মল্লিক, সংগীতঃ সত্য সাহা, প্রযোজনাঃ নূহাশ চলচ্চিত্র, অভিনয়ঃ আবুল হায়াত, ডলি জহুর, আসাদুজ্জামান নূর, বিপাশা হায়াত, শীলা আহমেদ, মোজাম্মেল হক, ফারুক আহমেদ, সালেহ আহমেদ, হোসনে আরা পুতুল প্রমুখ। মুক্তিকালঃ ১৯৯৪ (আগুনের পরশমণি, ১৯৯৪)।

আগুনের পরশমণি/হুমায়ূন আহমেদ/১৯৯৪

১৯৭১ সালের মে মাস। অবরুদ্ধ ঢাকায় ভীষণ নিস্তব্ধ রাতের বুক চিরে ছুটছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাঁজোয়া গাড়ির বহর। তীব্র হতাশা, তীব্র ভয়ে কাঁপছে বাংলাদেশের মানুষ। অবরুদ্ধ ঢাকার একটি পরিবারের কর্তা মতিন সাহেব ট্রানজিস্টার শোনার চেষ্টা করছেন মৃদু ভলিউমে। ভয়েস অব আমেরিকা, বিবিসি, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শোনার চেষ্টা করছেন। নব ঘোরাচ্ছেন ট্রানজিস্টারের। হঠাৎ শুনতে পেলেন বজ্রকণ্ঠের অংশ বিশেষ : 'মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি/রক্ত আরও দিবো/ এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম/এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।' কিছুই ভালো লাগে না মতিন সাহেবের বড়ো মেয়ে রাত্রির। তাদের পরিবারে কয়েকদিন পর হাজির হন মতিন সাহেবের বন্ধুর ছেলে বদি। বদি এবং তার সহযোদ্ধারা একের পর এক অভিযান করে সফলতা লাভ করে। কিন্তু এক এক করে তারা পাকবাহিনীর হাতে বন্দি হয়। একটি অপারেশনে গুলিবিদ্ধ হয় বদি। তাকে মতিন সাহেবের বাড়িতে রেখে ফেরার পথে ধরা পড়ে গেরিলাযোদ্ধা রাশেদুল করিম। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় থু-থু ছিটিয়েছেন পাকিস্তানি মেজরের মুখে। হাতের আঙুল কেটে ফেলা হয়েছে তাঁর। তবুও তিনি মাথা নোয়াননি। এদিকে কার্ফ্যু শুরু হওয়ায় বদিকে সারানোর মতো ডাক্তার, ঔষধের জন্য সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু তিনি কি পারবেন সকাল পর্যন্ত বাঁচতে? তিনি কি আরেকটি ভোরের সূর্যালোক দেখতে পাবেন? এভাবেই শেষ হয় চলচ্চিত্রের কাহিনি (https://bn.wikipedia.org/wiki/আগুনের_পরশমণি_(চলচ্চিত্র)।

অর্থাৎ আমরা দেখতে পাই, বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের কাহিনি অবলম্বনে *আগুনের পরশমণি* চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয়েছে। এতে মুক্তিযুদ্ধের কয়েকটি খণ্ড কাহিনির চিত্ররূপ উপস্থাপিত হয়েছে। মূলত শহরকেন্দ্রিক গেরিলা যুদ্ধ এবং তৎসংশ্লিষ্ট কয়েকটি পরিবারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার সমাবেশ এতে লভ্য। আরও রয়েছে মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ ও আবেগের রূপায়ণ। এতে সঞ্চরণশীল চরিত্রগুলোর বিকাশ একেবারে বাস্তববোধ বিবর্জিত নয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে নির্মিত মূলধারার সিংহভাগ চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা রূপায়িত হয়নি বলে সমালোচনা রয়েছে। সেই সাথে চলচ্চিত্রগুলোতে উপস্থাপিত নারী চরিত্রগুলোকে বাণিজ্যিক উপাদানরূপে ব্যবহারেরও অভিযোগ রয়েছে। *আগুনের পরশমণি* এসব অভিযোগ থেকে মুক্ত। কিন্তু এ যাবৎ নির্মিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রে নারীকে বলিষ্ঠরূপে হাজির করা হয়নি বলে যে দাবি রয়েছে *আগুনের পরশমণি* চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও তা একইরূপে প্রযোজ্য। এ ধারার প্রায় সব চলচ্চিত্র থেকে দর্শক উপলব্ধি করতে পারেন, মুক্তিযুদ্ধে শুধু বাংলাদেশের পুরুষেরাই সরাসরি অংশ নিয়েছে, নারী শুধু পাকহানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের নিপীড়নের শিকার হয়েছে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় এটি সত্য নয়। বাংলার নারীরাও প্রত্যক্ষভাবে অস্ত্র হাতে লড়াই করেছেন। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে পুরুষতান্ত্রিক দর্শনের যে প্রতিফলন, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রেও তারই ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায়। মুক্তিযুদ্ধের সিংহভাগ চলচ্চিত্রেই নারীকে ধর্ষিতারূপে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সেসব দৃশ্য নির্মাণে চলচ্চিত্র নির্মাতারা তাদের ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে ধর্ষণ দৃশ্য একটি প্রভাবশালী বাণিজ্যিক উপাদান বলে স্বীকৃত। এর মধ্য দিয়ে দর্শককুল বিশেষ করে পুরুষ দর্শকেরা অবদমিত যৌনসুখানুভূতি লাভ করেন। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া মুক্তিযুদ্ধ আশ্রয়ী সব চলচ্চিত্রে এই ধারাই অনুসৃত হয়েছে। আলোচ্য *আগুনের পরশমণি* চলচ্চিত্রটিতে নারীকে বাণিজ্যিক উপাদানরূপে উপস্থাপন করা হয়নি। কিন্তু পাশাপাশি এও সত্য যে, চলচ্চিত্রটিতে নারীচরিত্রের বলিষ্ঠতার দিক উন্মোচিত নয়।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা বলতে পারি, ২০১১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র *গেরিলা*'র কথা। এই চলচ্চিত্রটিতেও শহুরে গেরিলাদের বিভিন্ন অভিযান ও ঘটনা দৃশ্যায়িত হয়েছে। কিন্তু চলচ্চিত্র *গেরিলায়* নারী চরিত্রের বলিষ্ঠ রূপায়ণ রয়েছে। এতে আমরা শহরকেন্দ্রিক লড়াইয়ে একজন নারী গেরিলার সন্ধান পাই। আর তা ইতিহাস সম্মত তো বটেই এমনকি নান্দনিক বিচারেও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন

করে। কিন্তু নারী চরিত্রের এ ধরনের কোনো বলিষ্ঠ অবয়বের সন্ধান *আগুনের পরশমণি* চলচ্চিত্রটি দিতে সক্ষম হয় না।

আগুনের পরশমণি চলচ্চিত্রটিতে নারীকে চিরন্তন মাতৃরূপে উপস্থাপনের প্রয়াস লক্ষণীয়। সেকারণেই যুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যেও গেরিলা নেতা বদি যখন তার মায়ের সাথে দেখা করতে যায় সেখানে কথাচ্ছলে বদির আশ্রয়দাতার বড়ো মেয়ে রাত্রি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে শুরু করেন, তাকে বদির বউ করে আনার বিষয়ে ভাবতে থাকেন। অর্থাৎ যুদ্ধকালীন অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে মানুষ যেখানে প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর আশঙ্কাগ্রস্ত সেখানে মমতাময়ী মায়ের পুত্রের জন্য স্ত্রীর ভাবনা কিছুটা বাস্তববোধবর্জিত বলে বিবেচিত হয়। আর তা রূপায়ণ করা হয়েছে পিতৃতান্ত্রিক আদর্শের আদলে গড়া মাতৃপ্রতিমা তথা নারীর মধ্য দিয়ে। সন্তানের প্রতি মাতৃস্নেহের সর্বজনীনরূপ সেখানে লভ্য নয়। আমরা দেখতে পাই নারী চরিত্রগুলো *আগুনের পরশমণিতে* ঘটনার বাঁক বদল কিংবা নিয়ন্ত্রণে কোনোরূপ ভূমিকা রাখে না। তারা পরিস্থিতির শিকার হয়ে অলঙ্ঘণীয় কারাগারের মধ্যে বসবাস করে। কিন্তু সেই কারাগারে আটকে থাকার বিষয়টি সংলাপের মাধ্যমে যতটুকু বোঝানোর চেষ্টা অভিনয়ে ততটুকু ফুটে ওঠেনি। পাশাপাশি বিপদহন্তা হিসেবে স্রষ্টার কাছে প্রার্থনাই ছিল মাতৃরূপী নারী চরিত্রগুলোর মূল বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ এর মধ্য দিয়ে পিতৃতান্ত্রিক আদর্শ নারীর অবয়ব নির্মিত হয়। কেননা ধর্ম পুরুষতন্ত্রকে বৈধতা দেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করে। আর নারী যত বেশি ধর্মচর্চায় রত থাকবে পিতৃতান্ত্রিক আদর্শও তত রক্ষিত হবে। *আগুনের পরশমণি* চলচ্চিত্রে এ ধারার দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থাপনা রয়েছে। ফলে আমরা বলতে পারি, মুক্তিযুদ্ধের কাহিনি নিয়ে চলচ্চিত্রটি নির্মিত হলেও তা নারী চরিত্র উপস্থাপনের ক্ষেত্রটিতে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পুরোপুরি মুক্ত নয়।

রাঙা বউ

কাহিনি ও সংলাপঃ জামান আখতার, চিত্রনাট্য ও পরিচালনাঃ মোহাম্মদ হোসেন, চিত্রগ্রহণঃ আসাদুজ্জামান মজনু, সম্পাদনাঃ মনির হোসেন আবুল, সংগীতঃ আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল, অভিনয়ঃ হুমায়ুন ফরীদি, গোলাম মুস্তাফা, ঋতুপর্ণা, আমিন খান, আনোয়ার হোসেন, বাবর, অমল বোস, আফজাল শরীফ, সুরুজ বাঙালী, অর্পিতা দত্ত, মর্জিনা, রাশেদা, স্বরাজ মুখার্জী প্রমুখ। মুক্তিকাল : ১৯৯৮ (রাঙা বউ, ১৯৯৮)।

রাঙা বউ/মোহাম্মদ হোসেন/১৯৯৮

গ্রামে জমিদারদের অত্যাচার-নির্যাতনের যে ইতিহাস তারই ধারাবাহিকতা রক্ষা করে সে রকম পরিবারের এক সন্তান। মদ, নারী ও বাইজি নাচে আসক্তি আর বিকৃতিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে *রাঙা বউ* চলচ্চিত্রের কাহিনি। জমিদার পরিবারের সেই সন্তানের মাতৃপরিচয় জানা যায় না। তথাকথিত রক্তের দোষে সেই ব্যক্তিও নারী আসক্তিতে নিমজ্জিত হয়। এক পর্যায়ে হুমকি দিয়ে বিয়েও করে সেই গ্রামের এক নারীকে। কিন্তু প্রায়ই নানা অত্যাচারের শিকার হয় সেই নারী। পরক্ষণে ক্ষমাও চায় ওই ব্যক্তি। একদিন ঢাকার উদ্দেশে যাওয়ার পথে পূর্ব শত্রুতার জেরে কয়েকজন গুন্ডার হামলার কবলে পড়ে তারা। তাদের বহনকারী গাড়িটি বিধ্বস্ত হয়, আর ওই ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে যায় গুন্ডারা। এভাবেই বিচ্ছিন্ন হয় তারা। পরবর্তীসময়ে ওই ব্যক্তি অনেক খোঁজাখুঁজির পর নিজের স্ত্রীর মতো দেখতে এক নারীর সন্ধান পায়। কিন্তু সেই নারী তা অস্বীকার করে। এমনকি সেই নারীর বাবা ও অন্যরাও জানায় এই নারী ওই ব্যক্তির স্ত্রী এক নয়। কিন্তু ওই ব্যক্তি কিছুতেই তা বিশ্বাস করে না। এক পর্যায়ে ওই নারীকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার সময় সকল সত্য প্রকাশ হয়। জানা যায়, এই নারীই তার হারিয়ে যাওয়া স্ত্রী। কিন্তু বিয়েতে কবুল বলেনি বলে সেই বিয়ে বৈধ নয়। অতঃপর নিজ গুলিতে আত্মহত্যা করে ওই ব্যক্তি।

সহিংসতা ও যৌনতাকে পুঁজি করে ব্যাপকমাত্রায় চলচ্চিত্র নির্মাণের ফলে এটি নব্বই দশকের মূলধারা হিসেবে আবির্ভূত হয়, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ *রাঙা বউ*। চলচ্চিত্রে পুরুষতান্ত্রিক ভাবাদর্শের সব ধরনের নির্মাণ কৌশল এই চলচ্চিত্রটিতে প্রযুক্ত হয়েছে। আর এর শিকার হচ্ছে নারী। অর্থাৎ নারীকে পণ্য ও উপভোগের সামগ্রীরূপে যথেচ্ছভাবে এই চলচ্চিত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। এ কারণে চলচ্চিত্রটিতে যৌনতার ইঙ্গিতবাহী দৃশ্যের সরাসরি উপস্থাপন লভ্য। তবে সেই যৌনতার কোনো স্বাভাবিক প্রকাশ এতে নেই। পুরুষের ধর্ষকামীরূপ এবং নারীকে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিজাত মর্ষকামীরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। অর্থাৎ নারীর ওপর পুরুষের পীড়নকে যৌন বিনোদন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এতে করে বাণিজ্যিকভাবে সাফল্য লাভ করে *রাঙা বউ*। চলচ্চিত্রটিতে অত্যাচারী সামন্তপ্রভু জোরপূর্বক দরিদ্রঘরের এক রূপবতী নারীকে বিয়ে করে। ইতঃপূর্বে লাম্পট্যের বংশীয়ধারা উল্লেখপূর্বক নব্য সামন্তপ্রভুও একই ধারার অনুবর্তী হওয়ার ঘোষণা দেয় এবং সে অনুযায়ী আরব্য রজনির রাজার মতো প্রতিদিনই নতুন নতুন নারীকে ভোগের নিমিত্ত সামন্তপ্রভুর কাছে হাজির করতে হয়। এর মধ্য দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সামন্তপ্রভুর ভোগলিপ্সার চূড়ান্তরূপ আমরা দেখতে পাই। এই অবস্থা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে তারই সহযোগীরা তাকে বিয়ে করিয়ে দেয়। কিন্তু তাও স্বাভাবিক পন্থায় নয়, জোরপূর্বক। লম্পটের কাছে মানুষ হিসেবে স্ত্রীর কোনো মর্যাদা প্রত্যাশিত নয় ফলে আমরা দেখতে পাই বাসররাতেই স্বামীকর্তৃক ধর্ষিত হচ্ছে স্ত্রী। আর সেটি দৃশ্যায়নের মধ্য দিয়ে দর্শক টানার ক্ষেত্রে পরিচালক-প্রযোজকের অসৎ কৌশল ও অসুস্থ মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক বলেন:

> তিন মিনিটব্যাপী এই সিকোয়েন্সে পুরুষটি নারীটির সমগ্র শরীর লেহন করে, কামড়ে ছিন্ন করে তার অন্তর্বাস। নারীটি পালাতে চাইলে তাকে চুলির মুঠি ধরে শুইয়ে দেয়, আঘাতে আঘাতে তাকে রক্তাক্ত করে। নারীর উপর যৌন নিপীড়নের উন্মুক্ত প্রদর্শনী হয় এখানে যা উন্মুক্ত গণসমর্থনে উদযাপিতও হয় কেননা অশ্লীলতার দায়ে তুমুল সমালোচিত হবার পরও ছবিটি দেশব্যাপী প্রচুর দর্শক সমাগম ঘটাতে সক্ষম হয় (সুলতানা, ২০০৫ : ৮৫)।

চলচ্চিত্রটিতে নারী অবমাননার চূড়ান্তরূপ প্রকাশিত হয়েছে। কেননা এতে নারীর অস্তিত্ব ছিল শুধু পুরুষের বিকৃত ভোগলিপ্সার শিকার হিসেবে। তার ব্যক্তিত্বের ন্যূনতম কোনো বিকাশ এতে পাওয়া যায় না। এক সামন্তপ্রভুর প্রতাপ তথা নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিকতার সর্বব্যাপ্ত সহিংসরূপ এই চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। তাতে সংগীতও ব্যবহৃত হয়েছে যৌনসংশ্লিষ্ট দৃশ্যগুলোর সহায়ক উপকরণ হিসেবে। নরনারীর যৌনসংশ্লিষ্ট উত্তেজনার বিভিন্ন শব্দ নানামাত্রায় ব্যবহার করে দৃশ্যগুলোকে আরও

ভয়াবহ মাত্রায় নিয়ে যাওয়া হয়। ক্যামেরার মাধ্যমে বিভিন্ন শটও ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন কোণ থেকে তাতে এই দৃশ্যগুলোতে আরও তীব্রতা সৃষ্টি হয়। নারীর শরীরের বিভিন্ন স্পর্শকাতর অঙ্গের ওপর আলো ফেলে নারীর মর্ষকাতর ভঙ্গিমা ক্লোজ, মিড ক্লোজ শটে ধারণ করা হয়। এর মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের যে বিকৃতি তার উন্মোচন ঘটে। পাশ্চাত্যে পর্ণোগ্রাফি বলতে যা বোঝায় তারই একটি দেশীয়রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি এই চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক বলেন:

> পর্ণোগ্রাফী তো শুধু নরনারীর কিছু নগ্ন চূড়ান্ত বা বিকৃত যৌন ক্রিয়াকলাপের প্রকাশ্য ও অতিরঞ্জিত উপস্থাপনই নয়, এর মুখ্য ভাবাদর্শ যৌনতা নির্মাণের মধ্যদিয়ে যৌন উপভোগের কেন্দ্রে স্বেচ্ছাচারী পৌরুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা যা পরোক্ষ প্রত্যক্ষ সব রককম উপায়েই মূল ধারার চলচ্চিত্রগুলোতে সাধিত হয় (সুলতানা, ২০০৫ : ৯০)।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে এধারাটি নব্বই দশকে শক্ত আসন গেড়ে বসে। ফলে চলচ্চিত্রে নারী আর চরিত্র হিসেবে হাজির হয় না, সেখানে তাকে যৌনবস্তুরূপেই ব্যবহার করা হয়। এতে করে সংস্কৃতি, নন্দনবোধ ও সমাজবাস্তবতার প্রতি সামগ্রিক পুরুষতান্ত্রিক বিকৃতরূপের উন্মোচন ঘটে। তাতে নারী চূড়ান্ত অর্থে ব্যক্তিত্বের বিকাশরহিত, নিপীড়িত, হীন ও অধঃস্তন অবস্থার প্রতিনিধিত্বকারী মাত্র। সমালোচকের ভাষায়:

> নিপীড়িত নারীরূপ নির্মাণের মধ্যদিয়ে এই যে যৌনতা নির্মাণ প্রক্রিয়া– সেখানে নমুনা হিসেবে 'রাঙাবউ' কোন বিচ্ছিন্ন উদাহরণ নয় বরং ঢাকাই চলচ্চিত্রের বর্তমান ধারাটি এখন সর্বতোভাবে বিকৃতকামী নৃশংস পৌরুষ নির্মাণে আচ্ছন্ন যেখানে যৌনবস্তু পরিচয়ে পর্যবসিত নারীর জন্য মানবিক কোন অস্তিত্ব অর্জনের পথটি একেবারে রুদ্ধ বলেই মনে হয় (সুলতানা, ২০০৫ : ৯০)।

পরিশেষে বলা যায়, চলচ্চিত্র নামক শিল্পমাধ্যমের আড়ালে *রাঙা বউ* পুরুষতান্ত্রিক বিকৃতির একটি প্রদর্শনী মাত্র।

আম্মাজান

কাহিনি: মনোয়ার হোসেন ডিপজল, সংলাপ, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা: কাজী হায়াৎ, চিত্রগ্রহণ: হারুণ-আল-রশীদ, সম্পাদনা: আমজাদ হোসেন, প্রযোজক: মনোয়ার হোসেন ডিপজল, সংগীত: আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল, অভিনয়: মান্না, মৌসুমী, আমিন খান, শবনম, ডিপজল, মিজু আহমেদ, জ্যাকি, দারাশিকো, আলীরাজ, হিরু, দুলারী, সিরাজ হায়দার, কালা আজিজ, সোহেল প্রমুখ। মুক্তিকাল : ১৯৯৯ (আম্মাজান, ১৯৯৯)।

আম্মাজান/কাজী হায়াৎ/১৯৯৯

দারিদ্র্যের কারণে পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার হয় আম্মাজান। আর তাই দেখে ফেলে তার শিশুসন্তান। সেই শিশু খুন করে ধর্ষককে। এই অপরাধে যাবজ্জীবন দণ্ড হয় মা-ছেলে দুজনেরই। দণ্ডের মেয়াদ অন্তে ছাড়া পায় দুজনেই। ধর্ষিতা হওয়ার পর থেকে সন্তানের সঙ্গে কথা বলে না আম্মাজান। এরই মাঝে ওই শিশু যুবকে পরিণত হয়, পরিণত হয় স্থানীয় ত্রাসে। ওই যুবকের একটি মাত্র লক্ষ্য জীবনে, আর তা হচ্ছে আম্মাজানকে খুশি করা, তার মুখে হাসি ফোটানো। পাশাপাশি একটি কাজ খুব গুরুত্বের সঙ্গে করে ওই যুবক, তা হচ্ছে, ধর্ষককে খুন। প্রতিবার এমন হত্যাকাণ্ডে যাওয়ার আগে আম্মাজানকে জানিয়ে যায় ওই যুবক।

এক সময় দেশে বন্যা দেখা দিলে আম্মাজান বন্যার্ত ও দুর্গত মানুষদের সাহায্য করার জন্য বন্যাকবলিত এলাকায় ত্রাণসামগ্রী বিতরণে যায়। সেখানে প্রভাবশালী এক ব্যক্তির মেয়েকে ছেলের বউ করে নিতে চায় আম্মাজান। ওই যুবক তা জানতে পেরে ওই মেয়েকে বিয়ে করার জন্য উঠে-পড়ে লাগে। কিন্তু প্রভাবশালী সেই ব্যক্তি ওই যুবকের সঙ্গে তার মেয়ে বিয়ে দিতে চায় না। সে তার প্রধান ক্যাডারকে ডেকে সব বলে। ফলে ওই ক্যাডারের সঙ্গে ওই যুবকের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এদিকে ওই মেয়েও অন্য একজনকে ভালোবাসে। পরিস্থিতি বিবেচনায় ওই নারী বিদেশে চলে যেতে চাইলে বিমানবন্দর থেকে তাকে তুলে নিয়ে আসে ওই যুবক। নিজে বর সাজতে চলে যায়। এই ফাঁকে ওই নারী আম্মাজানকে জানায় যে সে অন্য একজনকে পছন্দ করে। আম্মাজান তাকে আশ্বস্ত করে, যুবক তাকে বাসায় পৌঁছে দেবে। ইতোমধ্যে যুবকের বাসায় এসে হাজির হয় সেই প্রভাবশালী ব্যক্তির ক্যাডার। আম্মাজানকে গুলি করে ওই নারীকে নিয়ে চলে যায় ক্যাডার। আম্মাজানকে নেওয়া হয় হাসপাতালে। ওই যুবক বুঝতে পারে আম্মাজান বাঁচবে না বেশিক্ষণ। কিন্তু আম্মাজানের মুখে হাসি দেখার জন্য ওই যুবক বিয়ের আসর থেকে ওই নারীকে তুলে নিয়ে আসে হাসপাতালে। তখন ক্যাডারের গুলিতে ঝাঝরা হয়ে যায় ওই যুবকের পিঠ। আম্মাজানের নির্দেশে ওই নারীকে তার প্রার্থিত মানুষের হাতে তুলে দিয়ে ওই যুবক আম্মাজানের মুখের হাসি দেখতে চায়। অতঃপর আম্মাজান ও যুবক দুজনেই মারা যায়।

আম্মাজান চলচ্চিত্রটির আধেয় বিশ্লেষণে দেখা যায়, পুত্রের সম্মুখে মাতা ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। এ কারণে অর্থাৎ ধর্ষিতা হওয়ায় মাতা তার পুত্রের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্করহিত জীবন যাপন করছে। তখন ধর্ষণের প্রকৃত ভয়াবহতার ওপর ভিন্ন এক মাত্রা যুক্ত হয়। এ প্রসঙ্গে সমালোচক বলেন:

> মাতা-পুত্রের মধ্যকার নির্বাক সম্পর্ক ধর্ষণের ভাবাদর্শগত শক্তিকে এখানে পুনঃপ্রমাণ করে। ধর্ষিতার পক্ষে স্বাভাবিক পারিবারিক জীবন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ, মমতাময়ী স্টেরিওটাইপ মাতৃত্বও তার জন্য প্রযোজ্য নয়– সেই কারণে এই নারী নিজেকে জীবিত মৃতদেহ বলে ক্রমাগত দাবি করে যায় (সুলতানা, ২০০৫ : ৬৭)।

চলচ্চিত্রটির কাহিনি ধর্ষণকে উপজীব্য করেই আবর্তিত হয়েছে। পুরো চলচ্চিত্রের কাহিনি নিষ্পত্তিতে ধর্ষণ এক শক্তিশালী নিয়ামকের ভূমিকা পালন করেছে। মায়ের ধর্ষিতা হওয়ার দৃশ্য দর্শনে এক কিশোর ক্রমে আধিপত্যবাদী মাস্তানে পরিণত হয়। যেখানেই ধর্ষণ সংঘটিত হয় সেখানেই সে ছুটে যায় এবং হত্যার মধ্য দিয়ে ধর্ষকের শাস্তি নিশ্চিত করে। অর্থাৎ বিদ্যমান আইনের প্রতি তার বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। এ কারণে সে নিজেই আইন প্রয়োগকারীর ভূমিকায় আবির্ভূত হয়। এর মধ্য দিয়ে সমাজে বিরাজমান মাস্তানতন্ত্রের ওপর মহত্ব আরোপ করা হয় যা পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিজাত। যেহেতু সে ধর্ষণের শাস্তি বিধানকারী পুরুষ তাই তার অন্য অনেক দোষই ঢাকা পড়ে যায়। নারী নির্যাতকের বিরুদ্ধে তার হাত সদা উদ্যত হলেও নিজেই নারী নির্যাতকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে জোরপূর্বক বিয়ে করতে চায় অপরের বাগদত্তাকে। বিয়ে করতে চাওয়ার ক্ষেত্রে এই জবরদস্তিমূলক আচরণও

পুরুষাধিপত্যের চিহ্ন। অর্থাৎ ক্ষমতাবান পুরুষ চাইলে যে-কোনো নারীকে বিয়ে করতে পারে তাতে নারীর সম্মতি থাক বা না থাক তাতে কিছু যায় আসে না। ফলে এখানে নারী হয়ে ওঠে ক্রীড়নক, অধঃস্তন সারির প্রতিভূ।

আমরা লক্ষ করি, আম্মাজানের যে প্রভাব তা তার মাস্তানপুত্রের কল্যাণে। ব্যক্তিগত এমন কোনো নৈপুণ্য তিনি উপস্থাপন করেননি যাতে তার কোনো প্রভাববলয় তৈরি হতে পারে। এখানেও পুরুষতন্ত্র সক্রিয়। অর্থাৎ পুরুষের শক্তি ছাড়া নারী নিছক পুতুল মাত্র। তার নিজস্ব কোনো সামর্থ্য নেই। পুরুষের শক্তিতেই নারী বলীয়ান। আর তাই আম্মাজানের মাস্তানপুত্রের প্রায় সমতুল্য অপর মাস্তান আম্মাজানকে কয়েক দফা অপমান করতে ছাড়ে না। কারণ সে জানে আম্মাজানের নিজস্ব কোনো শক্তি নেই। তাই তাকে চাইলে হেনস্তা করা যেতে পারে।

নব্বই দশকেই চলচ্চিত্রে মাস্তান চরিত্রটি নতুন মহিমা নিয়ে আবির্ভূত হয়। এ ক্ষেত্রে ব্যাপক সহিংসতার দৃশ্যায়ন ছাড়াও নারী পীড়নের নানা ধরন উপস্থাপিত হয়ে থাকে। আর তা এই বিবেচনাতেই যে, তাতে পুরুষ দর্শকের মনোরঞ্জন নিশ্চিত হয়। পাশাপাশি এ ধরনের চলচ্চিত্র দর্শনে নারী দর্শকও পুরুষকে পুনরায় পরাক্রমশালী অবস্থানে রেখে সমাজে জারি থাকা নারী-পুরুষের বিভাজিত সম্পর্কটি পুনরায় ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ পান। এতে তাদের মধ্যে সদা জাগ্রত ভীতি আরও পাকাপোক্ত হয়, সতীত্ব অর্থাৎ দেহের তথাকথিত পবিত্রতাই নারীর জীবনে সব এ জাতীয় পিতৃতান্ত্রিক আদর্শ ও মতবাদ আরও শক্ত পাটাতনের ওপর দাঁড়ায়। এ দশকে চলচ্চিত্রে ধর্ষণের বহুমুখী প্রতিক্রিয়া ব্যাপকমাত্রায় ব্যবহারের প্রতিক্রিয়ায় সমালোচক বলেন:

> অতএব ধর্ষণ আছে এবং বর্তমান পীড়ক পৌরুষ নির্মাণকারী চলচ্চিত্রধারা অব্যাহত থাকলে ধর্ষণ থাকবেই একথাও নিশ্চিত করে বলা যায়। উল্লেখ্য এই যে, যেই দেশের মূলধারার চলচ্চিত্র সংস্কৃতিতে ধর্ষণ সর্বসাধারণের বিনোদন যুগিয়ে চলে সেই দেশের পুরুষ মানসে নারীত্বের চরম অবমাননাকর অবস্থানটির পরিবর্তন যে এক প্রকার দুঃসাধ্য তা অনুধাবনের জন্য অন্য কোন উদাহরণের প্রয়োজন পড়ে না (সুলতানা, ২০০৫ : ৬৮)।

পরিশেষে বলা যায়, *আম্মাজান* নামকরণের মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রটিতে নারী চরিত্রের বলিষ্ঠতা চিত্রায়ণের আভাস থাকলেও প্রকৃতপক্ষে এতে নারী চরিত্রকে হীন ও অধঃস্তনরূপে বহাল রেখে পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যবাদী আদর্শই প্রচার করা হয়েছে। সাধারণ বিবেচনায় বলা যেতে পারে:

> পৃথিবীতে যতগুলো শিল্পমাধ্যম রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে নারীর অংশগ্রহণ সবচেয়ে বেশি চলচ্চিত্রে। দৃশ্যমাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রে নারীর সৌন্দর্য আর দেহকে প্রদর্শনের ব্যাপারে যতটুকু গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে অন্যকোনো শিল্পমাধ্যমের ক্ষেত্রে ততটা হয়নি। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে পুরুষের আধিপত্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে আদর্শ নারীরূপ চলচ্চিত্রে যেভাবে প্রকাশিত, নারীর মেধা ও সৃজনশীলতা সেভাবে স্বীকৃত নয়। পুঁজিবাদী ও ভোগবাদী সমাজ ব্যবস্থায় সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ পুরুষের হাতে। তাই রাজনীতি থেকে শুরু করে অর্থনীতি ও শিল্পকলার সম্মুখসারিতে নারীকে যেমন মেনে নেওয়া হয় না, ঠিক তেমনিভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণ ও বাণিজ্যের পুরোভাগে নিয়ন্ত্রণের আসনে নেই নারী (আহমেদ, ২০১৬ : ১০০)।

যে কারণে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে বলিষ্ঠ চরিত্ররূপে নারীকে তেমন খুঁজে পাওয়া যায় না। যার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থাকে নব্বইয়ের দশকে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলোতেও। তাতে পুরুষতন্ত্রের জয়কীর্তন আর নারীকে ভোগ্যপণ্যরূপেই ব্যবহার করা হয়েছে মুনাফার লোভে।

উপসংহার

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে এদেশে চলচ্চিত্রচর্চার সূত্রপাত। সময়ের বিবর্তনে অত্র অঞ্চলে তা জনপ্রিয়তম শিল্পমাধ্যমে পরিণত হয়। অপরাপর শিল্পমাধ্যমের মতো চলচ্চিত্রও সমকালীন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অনুঘটকগুলোকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারে না। কারণ চলচ্চিত্র সয়ম্ভূ কোনোকিছু নয়। এর নির্মাতা মানুষ আর মানুষ কোনো না কোনো সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলেই বেড়ে ওঠে। তার সেই বেড়ে ওঠার মধ্যদিয়েই গঠিত হয় নন্দনতাত্ত্বিক বোধ, যার প্রতিফলন ঘটে তার কর্মে। আমরা লক্ষ্য করি, সংখ্যাতাত্ত্বিক দিক দিয়ে চলচ্চিত্রে বিপুল সংখ্যক নারীর অংশগ্রহণ পরিবর্তিত সাংস্কৃতিক ও সমাজ ব্যবস্থার কারণে সম্ভবপর হয়েছে। কিন্তু নন্দনবোধের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত পরিপক্বতা অর্জিত হয়নি। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ নব্বই দশকে নির্মিত বাংলাদেশের মূলধারার প্রতিনিধিত্বকারী চলচ্চিত্রগুলো। পুঁজিবাদী পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যকেই মূল কারণ বলে আমরা আবিষ্কার করি। আমরা লক্ষ্য করি, বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে নারী চরিত্রের উপস্থাপনের যে ধারা তাতে সক্রিয় নারীরূপ বলতে কিছু নেই, অর্থাৎ নারীরা নিষ্ক্রিয়রূপে চলচ্চিত্রে উপস্থাপিত হয়। নিষ্ক্রিয় এই অর্থে যে, তাতে তার কোনো ভূমিকা নেই। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পরিচালিত চলচ্চিত্র বাণিজ্যে নারী সর্বত্রই একই ছকে বাঁধা। পুরুষের আধিপত্য খর্ব হওয়ার আশঙ্কায় নারীর স্বাধীন অবস্থান অর্জনকে ভীতির চোখে দেখা হয়। পুঁজি ও পণ্য মানসিকতার ক্ষতিকর প্রভাব আমাদের চলচ্চিত্রে সুদূর প্রসারী। যে কারণে কিছু বিক্ষিপ্ত নন্দনবোধ সম্পন্ন চলচ্চিত্র নির্মিত হলেও তা স্থায়ী কোনো ধারা তৈরি করতে পারছে না। অথবা ওই ধারাটিকে বেগবান হতে দেওয়া হচ্ছে না। ফলে চলচ্চিত্রের মত সর্বব্যাপ্ত একটি শিল্পমাধ্যমে নারীর উপস্থিতি কতিপয় পূর্বধারণা আর ঐতিহ্যের বৃত্তে আবদ্ধ হয়ে আছে। সার্বিক বিচারে এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না, বাংলাদেশে নব্বইয়ের দশকে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলোতে কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া নারীর অংশগ্রহণ মানে নিষ্ক্রিয়, প্রথাগত, ভোগ্যবস্তু ও মূল পুরুষ চরিত্রের বিকাশে সহযোগী এবং বিনোদন দানকারী পণ্য মাত্র।

তথ্যসূত্র

গ্রন্থ

ভাসীন, কমলা, (১৯৯৫), পিতৃতন্ত্র কাকে বলে? (অনু. দেবারতি সেনগুপ্ত ও পারমিতা ব্যানার্জি), স্ত্রী প্রকাশনী, কলকাতা।

নাসরীন, গীতি আরা এবং হক, ফাহমিদুল (২০০৮), *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প: সংকটে জনসংস্কৃতি*, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা।

সুলতানা, শেখ মাহমুদা (November 2005), 'ঢাকাই চলচ্চিত্র : নারী পর্দার ভিতরে ও বাইরে', *Forum on Women Security and International Affairs, Bangladesh Freedom Foundation*, ঢাকা।

প্রবন্ধ

আহমেদ, রুবাইয়াৎ (২০১৬), 'চলচ্চিত্রের উদ্ভব ও বিকাশের ধারায় নারীর অংশগ্রহণ', *বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট পত্রিকা*, সংখ্যা ৩, বর্ষ ২, ভলিউম ২, *বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট, ঢাকা।*

ওয়েবসাইট

'আগুনের পরশমণি' চলচ্চিত্রের কাহিনি, Available at: https:// bn.wikipedia.org/wiki/আগুনের_পরশমণি_(চলচ্চিত্র) (accessed 10 August 2022)।

'দাঙ্গা' চলচ্চিত্রের কাহিনি, Available at: https:// bn.wikipedia.org/wiki/দাঙ্গা_(১৯৯২-এর_চলচ্চিত্র) (accessed 10 August 2022)।

সিডি

আগুনের পরশমণি (১৯৯৪) ঢাকা : লেজার ভিশন।
আম্মাজান (১৯৯৯) ঢাকা : লাভা অডিও ভিডিও সেন্টার।
কেয়ামত থেকে কেয়ামত (১৯৯৩) ঢাকা : নিউ ঈগল ভিডিয়ো।
দাঙ্গা (১৯৯২) ঢাকা : নিউ ঈগল ভিডিয়ো।
রাঙা বউ (১৯৯৮) ঢাকা : লাভা অডিও ভিডিও সেন্টার।